উদীয়মান প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে

হীরেন পণ্ডিত

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং শাখা-প্রশাখা: আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স অথবা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কম্পিউটার বিজ্ঞানের একটি শাখা, যেখানে মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তাশক্তিকে কম্পিউটার দ্বারা অনুকৃত করার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার ভেতর এমন একটি শাখা হয়ে উঠেছে যেখানে এমন সফটওয়ার তৈরি করতে হয় এবং মেশিন লার্নিংয়ের সঙ্গে কানেক্টেড করতে হয় যা মূলত বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করে থাকে। রোবটিক টেকনোলজিতেও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার এখন বিশদ অর্থাৎ যে কোনো মেশিনের বিশেষ করে রোবটের মানুষের মতো আচরণ করতে পারার ক্ষমতাকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়, মূলত কিছু সফটওয়ার তৈরি হয়েছে এ ধরনের ক্ষমতা প্রদর্শন করার জন্য এবং অন্য কোনো মেশিনকে মানুষের মতো আচরণ করতে সাহায্য করার জন্য।

মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তাশক্তিকে কৃত্রিম উপায় প্রযুক্তিনির্ভর করে যন্ত্রের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করাকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বলে। লেকার বেনযাবিন ২০২৩ সালে বলেন যে, কম্পিউটারকে মিমিকস কগনেটিক এককে আনা হয় যাতে করে কম্পিউটার মানুষের মতো ভাবতে পারে। যেমন– শিক্ষা গ্রহণ এবং সমস্যার সমাধান। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) হলো মেশিন দ্বারা প্রদর্শিত বুদ্ধি। কম্পিউটার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, এআই 'বুদ্ধিমান এজেন্ট'-এর অধ্যয়ন হিসেবে নিজেকে সংজ্ঞায়িত করে: যে কোনো যন্ত্র যা তার পরিবেশকে অনুধাবন করতে পারে এবং এমন কিছু পদক্ষেপ নেয় যা লক্ষ্য অর্জনে তার সাফল্যকে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে নেয়। যখন একটি মেশিন 'জ্ঞানীয়' ফাংশনগুলোকে কার্যকর করে যা অন্যান্য মানুষের মনের সঙ্গে মিল থাকে, যেমন– 'শিক্ষা গ্রহণ' এবং 'সমস্যা সমাধানের' সঙ্গে সংযুক্ত, তখন 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। আন্দ্রেয়ার কাপলান এবং মাইকেল হেনলিন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সংজ্ঞায় বলেন 'এটি একটি সিস্টেমের বহির্ভূত তথ্য সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারার ক্ষমতা, এমন তথ্য থেকে শিক্ষা গ্রহণ এবং ওই শিক্ষা ব্যবহার করে নমনীয় অভিযোজনের মাধ্যমে বিশেষ লক্ষ্য করা।

মেশিনগুলো যখন ক্রমবর্ধমানভাবে সক্ষম হয়ে উঠে তখন মানুষের সুবিধার জন্য বুদ্ধিমত্তাকে সংজ্ঞা থেকে সরিয়ে ফেলার প্রয়োজন হয়। উদাহরণস্বরূপ, অপটিক্যাল অক্ষর স্বীকৃতিটি 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা' উদাহরণ হিসেবে আর অনুভূত হয় না, তখন এটি একটি নিয়মিত প্রযুক্তি হয়ে ওঠে। বর্তমানে যে সক্ষমতাগুলোকে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে সেগুলো মানুষের বক্তব্যকে সফলভাবে বুঝতে পারে, কৌশলগত গেম সিস্টেম যেমন–দাবা খেলায় অংশগ্রহণ করার মতো উপলব্ধি এবং পরবর্তী পদক্ষেপগুলো পর্যালোচনা করার মতো কাজ করতে পারে উচ্চতর স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে গাড়ি চালাতে পারে সামরিক সিমুলেশন এবং জটিল উপাত্তগুলো ব্যাখ্যা করতে পারে।

এআই গবেষণাকে কতগুলো উপশাখায় বিভক্ত করা যেতে পারে যা নির্দিষ্ট সমস্যা, দৃষ্টিভঙ্গি, বিশেষ সরঞ্জামের ব্যবহার বা নির্দিষ্ট অ্যাপ্লিকেশনগুলোর সেরা পারফরমেন্সের দিকে নজর দেয়। আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স, বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ঠিক কী করতে পারে, আর কী করতে পারে না! এই সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা তৈরি করতে গেলে আগে কয়েকটি বিষয়ে জেনে রাখা প্রয়োজন। কৃত্রিম মেধার কাজ করার জন্য লাখ লাখ তথ্যেও রেকর্ড প্রয়োজন এবং প্রয়োজনীয় কম্পিউটার প্রসেসিং ক্ষমতাও লাগে। একাধিক তথ্যকে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করে একটি নথি তৈরি করতে পারাকে বলা হয়ে থাকে বিগ ডেটা। এরপর, চ্যাটবট হলো ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট একটি শাখা বলা যেতে পারে, যা প্রথাগতভাবে একটি এজেন্টের মতো কাজ করে। এটি প্রশ্নকর্তার সঙ্গে সরাসরি কথা বলে যতটা সম্ভব নির্ভুল উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে। তাছাড়া, চ্যাটজিপিটি ও একটি কৃত্রিম মেধার সংস্করণ যা অর্থপূর্ণ ল্যাঙ্গুয়েজের মডেলের উপর নির্ভর করে তৈরি করা একটি ইন্টারফেস। এর নির্মাণকারী সংস্থা হলো ওপেনআই। বিপুল পরিমাণ তথ্য ব্যবহার করে কীভাবে ভাষাগত কাজ করে ফেলতে হবে তা শেখানো হয়েছে এই চ্যাটজিপিটিকে। এরপর রয়েছে, ক্লাউড রোবোটিকস যা ক্লাউড কম্পিউটিং, ক্লাউড স্টোরেজসহ নানা ধরনের ক্লাউড টেকনোলজি ব্যবহার করতে পারে এই বিশেষ রোবোটিকস। মানুষও চাইলে দূর নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে এটি ব্যবহার করতে পারে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কিংবা, আর্টিফিসিয়াল নিউট্রাল কাজের

জন্য ব্যবহার করা হয় এই ডিপ লার্নিং প্রসেস। এই পদ্ধতিতে কাজের মাধ্যমে কম্পিউটার এবং অন্য ডিভাইসগুলোকে শেখানো হয় কাজের ধারা, ঠিক যেমন মানুষ শেখে। এজ কম্পিউটিংয়ের কাজ হলো, অনেক বেশি তথ্য পাওয়া, ভুলের পরিমাণ কম করা ইত্যাদি কাজে সাহায্য করা। ডেভেলপার এবং এন্টারপ্রাইজগুলো রিয়েল টাইম ডেটা প্রসেসিং ব্যবহার করে কাজ করে। ভিডিও গেমের জন্য ব্যবহার করা হয় এই গেম এআই। নন-প্লেয়ার ক্যারেক্টারের ভেতর ঠিক মানুষের মতো বুদ্ধিমত্তা তৈরি করাই হলো গেম আই-এর কাজ। ওপেনএআই-এর সর্বশেষ সংযোজন হতে চলেছে জিপিটি ৪। জিপিটি মডেলের এটিই প্রথম মাল্টিমোডাল মডেল। অর্থাৎ এটি একই সঙ্গে ছবি ও টেক্সট ইনপুট নিতে পারে এবং তা থেকে টেক্সট আউটপুট দিতে পারে। লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম যা ব্যবহার করা হয় মানুষের ভাষা কোড বুঝার জন্য। এমনকি মানুষের আবেগের ব্যাখ্যাও করতে পারে। অপরদিকে, মেশিন লার্নিং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অন্যতম ভিত্তি বলা চলে। এই প্রক্রিয়ায় যে কোনো মেশিন, যেমন– চ্যাটবট স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোনো কিছু শিখে ফেলতে পারে।

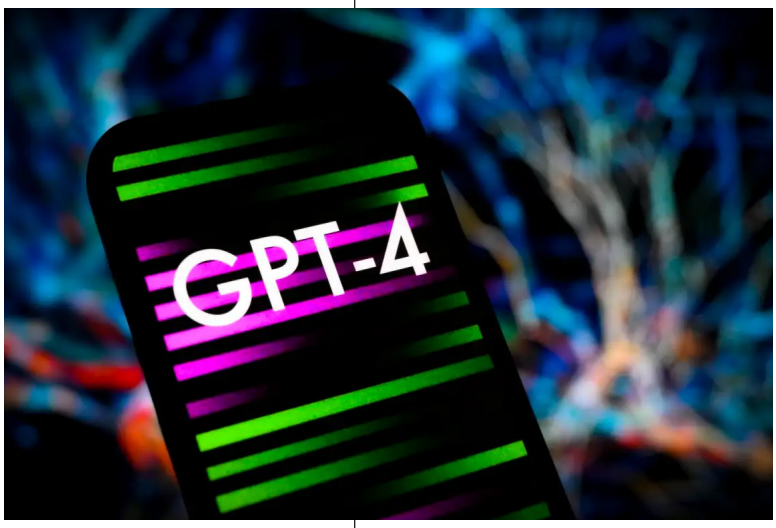

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিষয়ে বলা যায় যে, প্রাথমিকভাবে যদিও যুক্তি ও সমস্যাকেন্দ্রিক মেশিন লার্নিং প্রসেসিং শুরু করা হয়েছিল, তবে তার রূপ একটু একটু করে পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেমন– জ্ঞানের প্রতিনিধিত্ব ধরনের প্রচুর কাজ সম্পন্ন হতে পারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে। যেমন– সাধারণ জ্ঞানের বিস্তৃতি হওয়া, শিক্ষা ক্ষেত্রে এর ব্যবহার, পরিকল্পনা ক্ষেত্রে ব্যবহার করা ইত্যাদি। ইদানীং আবেগের বহিঃপ্রকাশ নিয়ে বেশকিছু গবেষণা চলছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে নিয়ে যার কারণে কিছু মহলের বিজ্ঞানী বেশ উদ্বিগ্নও বটে। ভাবের আদান-প্রদানে পারদর্শী হলে, শেক্সপিয়ারান ওথেলোর মতো অবস্থা হবে কিনা মানবজাতির, সেটি পরের পর্বে আলোচনা করা যেতে পারে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যখন আশীর্বাদ: বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে আলোচিত বিষয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। এটি নিয়ে একদিকে তৈরি হয়েছে উচ্ছ্বাস, অন্যদিকে উৎকণ্ঠা। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানবজাতির জন্য আশীর্বাদ না অভিশাপ তা নিয়ে তর্কবিতর্ক চলতেই থাকবে। অবশ্য খোদ সাইন্স বা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও কি এমন তর্কবিতর্ক এখনো চলছে না? এমন প্রশ্ন থাকবার পরও কি বিজ্ঞানের গতিপথ থমকে গিয়েছে? গত ২১ মার্চ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-সম্পর্কিত প্রথম বৈশ্বিক রেজুলেশন বা প্রস্তাব পাশ হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাবটি উত্থাপন করে এবং এর প্রস্তাবক ছিল আরো ১২৩টি দেশ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা হয়তো রয়েছে; কিন্তু একটি নূতন প্রযুক্তির সবই খারাপ এমন মন-মানসিকতা পোষণ করা কোনোভাবেই কাম্য নয়।

বাংলাদেশে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় যক্ষ্মা শনাক্তে সাফল্য আসতে পারে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই প্রক্রিয়ায় যক্ষ্মা নির্ণয় সফল হয়েছে। বাংলাদেশে যদি রোবটের মাধ্যমে হার্টের চিকিৎসায় সফলতা পাওয়া যায়, তা হলে এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে অন্যান্য জটিল চিকিৎসার ক্ষেত্রেও কেন সফলতা পাওয়া যাবে না? আমাদের দেশে রোবটের মাধ্যমে টেলিভিশনের খবর পাঠ, রেস্টুরেন্টে খাবার পরিবেশন এমনকি গার্মেন্টসসহ বিভিন্ন কলকারখানায় শ্রমিক হিসাবে এর প্রচলন শুরু হয়েছে। এটি একটি বিরাট পরিবর্তন নিঃসন্দেহে। এত চাকুরি-বাকুরির ক্ষেত্রে নানা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে বলে কেউ কেউ আশঙ্কা প্রকাশ করলেও অনেকে আবার এ ব্যাপারে আশাবাদী। তারা বলছেন, এত রোবটিক শিল্পে নূতন নূতন দক্ষতাসম্পন্ন লোকের প্রয়োজন হবে। অনুরূপভাবে এই মুহূর্তে যক্ষ্মা চিকিৎসায় এআই প্রযুক্তি ব্যবহারের খবরে আমরা আশান্বিত হই। আগামী বছর দেশের তিনটি জেলায় (ঢাকা, খুলনা ও পঞ্চগড়) প্রাথমিক পর্যায়ে এই সংক্রান্ত পাইলট প্রকল্পের কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছে ইনস্টিটিউট অব অ্যালার্জি অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল ইমুনোলজি অব বাংলাদেশ বা আইএসিআইবি। ভারতীয় উপমহাদেশে এখনো যক্ষ্মা শনাক্তে এইআই প্রযুক্তি ব্যবহারের পাইলটিং চলছে। যুগের চাহিদা অনুযায়ী এই দেশেও এমন উদ্যোগের কথা যাহারা চিন্তাভাবনা করছেন, তাদের আমরা স্বাগত জানাচ্ছেন সবাই। কেননা একসময় বলা হতো ঙক্ষা হলে রক্ষা নাই। এখন সেখানে এই রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থায় প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। তার পরও চলমান পদ্ধতিতে যক্ষ্মা নির্ণয়ে সমস্যা রয়েছে। সঠিকভাবে যক্ষ্মা রোগী শনাক্ত করতে না পারায় বহু রোগী দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন। এত অনেকে যক্ষ্মা শনাক্তের বাইওে থেকে যাচ্ছেন। বিভিন্ন জটিল ও কঠিন রোগব্যাধির ক্ষেত্রে আমরা যদি এইভাবে এআই প্রযুক্তির সাহায্যে সফলতা অর্জন রেতে পারি, তাহলে এটি আমাদেও সকলের জন্য আশীর্বাদ হতে পারে।

বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং এআইয়ের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার মানবজাতির জন্য ভয়াবহ হুমকির কারণ হতে পারে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। টেক জায়ান্ট গুগলের সাবেক প্রধান নির্বাহী এরিক স্মিড সকল কিছু পর্যবেক্ষণ করে এটি মানবসভ্যতা ধ্বংসের কারণ হত পারে বলে মন্তব্য করেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী গ্যারি মার্কাস এটিকে একটি কাচের ঘরে ষাঁড় ঢুকে যাবার সাথে তুলনা করেছেন। তবে এটি যতদিন মানুষের নিয়ন্ত্রণে থাকবে, ততদিন কোনো সমস্যা হবে না। এই জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উপরে একটি যৌক্তিক নিয়ন্ত্রণ চান স্বয়ং চ্যাটজিপিটির প্রধান নির্বাহী জেমস ক্লেটনও। এর জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করে এর হিতকর ব্যবহারের প্রতি জোর দিতে হবে সবচাইতে বেশি। যক্ষ্মা শনাক্তে এআই প্রযুক্তি ব্যবহারে সফলতায় সেই আশাবাদের বাণীই প্রতিফলিত হয়েছে বলে অনেকেই মনে করে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ইন্টারনেট অফ থিংস একে অপরের পরিপূরক

আর্টিফিশিয়াল ইন্টলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ইন্টারনেট অফ থিংস বা আইওটি কীভাবে একে অপরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং কীভাবে তারা একযোগে কাজ করে কোনো একটা শিল্প প্রতিষ্ঠান কিংবা অন্য সংগঠন বা ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে বিশাল ভূমিকা রাখতে পাওে সেদিকটা একবার ভাবা যেতে পারে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ইন্টারনেট অফ থিংস বৈচিত্র্যময় আইটি সিস্টেমের স্বতন্ত্র ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে। তবে তাদের মধ্যে এক অন্তর্নিহিত বন্ধন সবসময়ই ছিল। আর যতদিন যাচ্ছে এদের মধ্যে পার্থক্য ততই কমে আসছে এবং এরা একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। যদি আপনি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে একটা সিস্টেমের ব্রেইন হিসেবে কল্পনা করেন, তাহলে আইওটিকে সেই সিস্টেমের ডিজিটাল নার্ভাস সিস্টেম কিংবা বাকি গোটা শরীর হিসেবে ভাবতেই হবে!

আগেই বলা হয়েছে, যত সময় যাচ্ছে ইন্টারনেট অফ থিংস দিন দিন ততই স্মার্ট হয়ে যাচ্ছে। ইন্টারনেট অফ থিংস ব্যবহার বাস্তবিকভাবে সবখানেই বিদ্যমান। হোম অটোমেশন সিস্টেম এবং ম্যানুফেকচারিং ন্যানোবোট থেকে শুরু করে সেলফ-ড্রাইভিং কার এবং হেভি ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেশিনারিজ পর্যন্ত এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে আইওটির প্রয়োগ নেই!

আইওটি বিশাল সংখ্যক বহনযোগ্য ডিভাইস, হোম অ্যাপ্লায়েন্স, ওয়ারেবল এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক্স ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেশিনকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে একে-অন্যের সাথে সংযুক্ত করে। এই সংযুক্ত ডিভাইসগুলো তাদের পরিবেশকে পর্যবেক্ষণ করতে পারে এবং এদেরকে দূর থেকে পর্যবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনা করা সম্ভব হয়। কিন্তু কাগজে-কলমে এই গোটা বিষয়কে অনেক সহজে কওে দেখানো সম্ভব হলেও বাস্তবে এখানে প্রচন্ড জটিল কিছু বিষয়াদি থাকে এবং সেগুলো আসলেই মারাত্মক গুরত্বপূর্ণ! বিগ ডাটা প্রসেসিং এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অবশ্যই লাগবে।

আইওটি থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে একদম ব্যবসায়িক লাভের জন্য ব্যবহার করা এক বিশাল কাজ, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আইওটি ডিভাইসগুলো সর্বশেষ ব্যবহারকারীদের অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। ফলে এই ডিভাইগুলোর তথ্যগুলো ব্যাপক বৈচিত্র্যময় হয়ে থাকে এবং এগুলোকে একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য সহজ আকারে আনার কাজটা প্রচন্ড জটিল হয়ে থাকে। এমনকি হেভি ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেশিনও বিভিন্ন পরিবেশগত অবস্থার কারণে অভিন্নভাবে কাজ সম্পাদন করতে পারে না, ফলে এদের থেকে প্রাপ্ত তথ্যের মাঝেও বৈচিত্র্য দেখা যায়।

এআই ও আইওটিকে সংমিশ্রণ করা হলে, আইওটি ডিভাইসগুলো অতিরিক্ত সক্ষমতা, যেমন- ইউজার ইন্টারঅ্যাকশন, সার্ভিস প্রোভাইডার এবং এমনকি এক ইকো-সিস্টেমের অন্যান্য ডিভাইস থেকে বিভিন্ন বিষয় শিখতে পারা, সিদ্ধান্তগ্রহণ এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী বিভিন্ন কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন করার সক্ষমতা অর্জন করে। অর্থাৎ ডিভাইসগুলো নতুন কোনো ইনপুট বা পরিবেশের যেকোনো পরিবর্তনের সাথে সাথেই কোনো রকম ম্যানুয়াল নির্দেশ ব্যতিতই নিজে থেকে যথাযথ কাজ করতে পারে।

আলাদা আলাদা প্রযুক্তি ব্যবহারের উপর নির্ভর করে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে বিশ্লেষণ ব্যবস্থা মোতায়েন করা। বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতিভেদে, বিশ্লেষণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বাস্তবায়ন কৌশল নির্বাচন ও প্রয়োগ করা যেতে পারে। যেমন- কখনও কখনও ডেটা ঘটনাস্থলেই বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন হতে পারে, আবার অন্য কোনো ঘটনার ক্ষেত্রে হয়তো ডাটাকে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করার দরকার হতে পারে।

এআইওটির সাফল্য যে কৃত্রিম-বুদ্ধিমত্তা ব্যতিত অর্জন করা সম্ভব নয় এ কথা বলাই বাহুল্য। আইওটি বাস্তবায়নের জন্য মেশিন লার্নিং, ন্যাচারাল ল্যাংগুয়েজ প্রসেসিং এবং কম্পিউটার ভিশন নিয়ে খুব নিবিড়ভাবে কাজ করতে হয়।

সম্পূর্ণ নতুন প্রজন্মের আইওটি সিস্টেমকে সম্ভব করে তুলছে, যেটা শুধু অসামান্যই নয়, বরং মহাবৈপ্লবিকও বটে! আইওটি যেটা করতে পারে না সেটা কৃত্রিম-বুদ্ধিমত্তা করতে পারে, এবং যেটা কৃত্রিম-বুদ্ধিমত্তা করতে পারে না সেটা আইওটি করতে পারে। আর এই দুইয়ের সংমিশ্রণ এআইওটি' বলতে গেলে সবকিছুই কওে ফেলতে পারে!

ই-গভর্নেন্স, ব্লকচেইন ও চতুর্থ শিল্পবিপ্লব: বিশ্ব সভ্যতাকে নতুন মাত্রা দিতে যাচ্ছে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব। এই বিপ্লবের প্রক্রিয়া ও সম্ভাব্যতা নিয়ে ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে। আলোচনা হচ্ছে আমাদের দেশেও। এই আলোচনার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে এক ধরনের সচেতনতা তৈরি বাংলাদেশকে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের নেতৃত্ব দানের উপযোগী করে গড়ে তুলে দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে কাজ করছে।

ব্লকচেইন একটি বিকেন্দ্রীভূত এবং টেম্পারিং প্রতিরোধী লেজার পদ্ধতি। একবার ব্লকচেইনে কোনও ডেটা বা লেনদেন নিবন্ধিত হয়ে গেলে, এটি পরিবর্তন করা যায় না, ফলে এটি অপরিবর্তনীয়। এছাড়াও, একটি ব্লক গঠন ও চেইনে যুক্ত হওয়ার আগে, নেটওয়ার্কগুলিতে সমস্ত অংশগ্রহণকারীদেও ডেটা যাচাই করা হয়। এই বৈধতা সম্মতি হিসাবে পরিচিত। ঐক্যমত হয়ে গেলে ব্লকটি অনুমোদিত হয় এবং একটি টাইমস্ট্যাম্প দেওয়া হয় যা পূর্ববর্তী ব্লকের সাথে সংযুক্ত হয়। এভাবে

অনেক গুলো ব্লক নিয়ে চেইন গঠন করে। তাই ব্লকচেইন প্রযুক্তি ডিজিটাল তথ্য সংরক্ষণ, শেয়ারিং ও যাচাইকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের আস্থা, দায়বদ্ধতা এবং স্বচ্ছতা বাড়িয়ে তুলতে সহায়তা করে। আর এজন্য বিভিন্ন সংস্থা অর্থ, পরিচয় ব্যবস্থাপনা এবং সরবরাহ চেইনের মতো শিল্পগুলিতে জালিয়াতি রোধে ব্লকচেইন প্রযুক্তি ব্যবহারের উপায়গুলি নিয়ে কাজ করছে।

ডিজিটাল পরিচয়ের মূল ভূমিকা হচ্ছে অনলাইন মাধ্যমে আমাদের আদান-প্রদানগুলো আরও সহজ, দক্ষ, সুরক্ষিত এবং ব্যক্তিগত করা। বর্তমান ডিজিটাল বিশ্বে অনলাইন পরিচয় পদ্ধতি হচ্ছে অনেকটাই কেন্দ্রীভূত। যেহেতু কেন্দ্রীভূত পরিচয় ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত তথ্য কোনো কেন্দ্রীভূত সার্ভারে সংরক্ষিত থাকে এবং কোনো একক পার্টি পরিচয় ইস্যু অধিকার রাখে। আর এই সার্ভারগুলো সাইবার আক্রমণের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

ভবিষ্যতের এক নতুন অধ্যায় ভার্চুয়াল রিয়েলিটি: বর্তমান সময়ে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যত ধরনের আবিষ্কার রয়েছে, তার মধ্যে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি বা সংক্ষেপে ভিআর অন্যতম। ভিআর শব্দের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা বাস্তবতা, অর্থগতভাবে শব্দ দু'টি যদিও স্ববিরোধী কিন্তু তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে এটি এমন এক ধরনের পরিবেশ তৈরি করে, যেটি বাস্তব নয়; কিন্তু বাস্তবের মতো চেতনা সৃষ্টি করে এবং মস্তিষ্কে একটি বাস্তব অনুভূতি জাগায়।

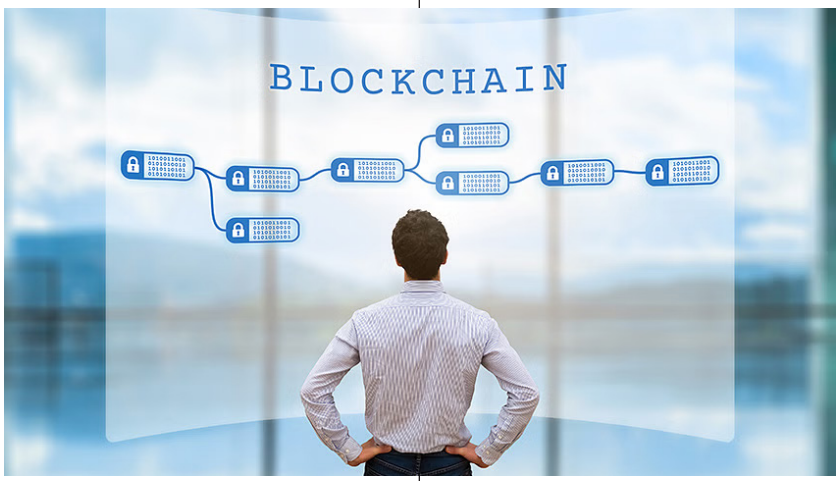

আমরা জানি-স্পর্শ, শোনা কিংবা দেখা থেকে মানুষের মস্তিষ্কে একটি অনুভূতির সৃষ্টি হয়, যেটাকে আমরা বাস্তবতা বলে থাকি। কতগুলো যন্ত্রের সাহায্যে যদি আমরা এই অনুভূতিগুলো সৃষ্টি করতে পারি, তাহলে অবস্থাটি মানুষের কাছে পুরোপুরি বাস্তব মনে হতে পারে। এটি নানাভাবে করা সম্ভব। অনেক সময় বিশেষ ধরনের চশমা বা হেলমেট পরা হয়, যেখানে দুই চোখে দু'টি ভিন্ন দৃশ্য দেখিয়ে ত্রিমাত্রিক অনুভূতি সৃষ্টি করা হয়। অনেক সময় একটি স্ক্রিনে ভিন্ন ভিন্ন প্রজেক্টর দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য দেখিয়ে সেই অনুভূতি সৃষ্টি করা হয়। এই প্রক্রিয়াগুলো সম্পাদন করার জন্য মূলত কম্পিউটারের সাহায্য নিয়ে হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের সমন্বয়ে কোনো একটি পরিবেশ বা ঘটনার বাস্তবভিত্তিক ত্রিমাত্রিক চিত্রায়ণ করা হয়। তাই বলা যায়, ভার্চুয়াল রিয়েলিটি হলো হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের মাধ্যমে তৈরীকৃত এমন এক ধরনের কৃত্রিম পরিবেশ, যা উপস্থাপন করা হলে ব্যবহারকারীদের কাছে এটিকে বাস্তব পরিবেশ মনে হয়। চলুন একটি উদাহরণ দেখি- রাসেল মঙ্গল গ্রহে যেতে চায়, কিন্তু সুযোগ ও অর্থের অভাবে যেতে পারছে না। কিন্তু তার কম্পিউটার সায়েন্সে পড়ুয়া বন্ধু তাকে নতুন একটি প্রযুক্তি সম্পর্কে জানাল, যেটা ব্যবহার করে সে মঙ্গল গ্রহে অবস্থান না করেও মঙ্গলে অবস্থান করার অনুভূতি পেতে পারে! রাসেল বন্ধুর কথামতো একটি প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের কাছে গেল এবং প্রতিষ্ঠানটি তাকে বেশ কিছু সরঞ্জাম দিল। যেমন হাতমোজা, চশমা, হেডফোন স্যুট ইত্যাদি। সে এসব পরিধান করে একটি কক্ষে প্রবেশ করল এবং অন্য আরো কিছু প্রযুক্তির সমন্বয়ে মঙ্গল গ্রহের মাটিতে অবতরণের অনুভূতি পেল। এখানে রাসেল যে প্রযুক্তি ব্যবহার করেছে, তাই হলো ভার্চুয়াল রিয়েলিটি।

ইতিমধ্যে বিশ্বের কিছু উন্নত দেশ এই প্রযুক্তির সুফল ভোগ করছে, তবে বেশির ভাগ দেশেই এখনো প্রযুক্তিটির ব্যবহার শুরু হয়নি। এমনকি বাংলাদেশেও ব্যক্তিপর্যায়ে ভিআরের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় না। সরকারি কিছু সংস্থা যেমন- মিলিটারি, ড্রাইভিং, পাইলটিং ইত্যাদি ক্ষেত্রেই শুধু এটি ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশে অনেকের কাছেই ভিআর প্রযুক্তিটি একেবারেই নতুন। তবে এর গোড়াপত্তন হয়েছিল বহু আগেই। যুক্তরাষ্ট্রের কম্পিউটার বিজ্ঞানী জেরন ল্যানিয়ারকে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির জনক বলা যায়। তিনি ১৯৮০-এর দশকে এই প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা করছিলেন এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান তৈরির কাজ করেন। তবে এর আগে ১৯৬১ সালে মার্কিন বিজ্ঞানী থমাস ফারনেস যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহিনীর জন্য একটি ফ্লাইট সিমুলেটর তৈরি করেন, যেটি ছিল বিশ্বের প্রথম সিমুলেশন প্রযুক্তি। এর ঠিক কয়েক বছর পরে এইচএমডি হেড মাউন্টেননড ডিসপ্লে এক ধরনের হেলমেট আবিষ্কার করেন ১৯৬৮ সালে। ধীরে ধীরে ভিআর প্রযুক্তি জনপ্রিয় হতে শুরু করে এবং ২০০৭ সালে গুগল স্ট্রিট ভিউ নামে তাদের ভিআর প্রযুক্তি আনে, যেটি বর্তমানে গুগল ম্যাপে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ভার্চুয়াল রিয়েলিটির পরিবেশ তৈরির জন্য কম্পিউটারে সংবেদনশীল শক্তিশালী গ্রাফিকস ব্যবহার করতে হয়। সাধারণ গ্রাফিকস আর ভার্চুয়াল জগতের গ্রাফিকসের মধ্যে তফাত হলো এখানে শব্দ এবং স্পর্শকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। ব্যবহারকারীরা যা দেখে এবং স্পর্শ করে তা বাস্তবের কাছাকাছি বোঝানোর জন্য বিশেষভাবে তৈরি চশমা বা হেলমেট ছাড়াও অনেক সময় হ্যান্ড গ্লাভস, বুট, স্যুট ব্যবহার করা হয়। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটারে গ্রাফিকস ব্যবহারের মাধ্যমে দূর থেকে পরিচালনা করার প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়। একে টেলিপ্রেজেন্স বলা হয়। এ ছাড়া এ পদ্ধতিতে বাস্তবভিত্তিক শব্দও সৃষ্টি করা হয়, যাতে মনে হয়, শব্দগুলো বিশেষ বিশেষ স্থান থেকে উৎসারিত হচ্ছে।

বর্তমানে সারা বিশ্বে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। বাংলাদেশে এর তেমন একটা উল্লেখযোগ্য ব্যবহার লক্ষ্য করা না গেলেও আস্তে আস্তে এর ব্যবহার বাড়ছে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, জাপান, চীন, জার্মানের মতো প্রথম বিশ্বের দেশগুলোতে ইতিমধ্যে এর ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়ে গেছে। বিশ্ব নাগরিকের জীবনযাত্রায় এখন ভিআর প্রযুক্তি নানাভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। নিচের অংশে আমরা জানব কোন কোন

ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে।

শিক্ষা ও গবেষণায় বাস্তবে কোনো কাজ করার আগে কম্পিউটারে কৃত্রিমভাবে প্রয়োগ কওে দেখাকে সিমুলেশন বলা হয়। শিখন-শেখানো কার্যক্রমে জটিল বিষয়গুলো ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মাধ্যমে সিমুলেশন ও মডেলিং করে শিক্ষার্থীদের সামনে সহজবোধ্য ও চিত্তাকর্ষকভাবে উপস্থাপন করা যায়। গবেষণালব্ধ ফলাফল বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, জটিল অণুর আণবিক গঠন, ডিএনএ গঠন, যা কোনো অবস্থাতেই বাস্তবে অবলোকন সম্ভব নয়; সেগুলো ভার্চুয়াল রিয়েলিটির পরিবেশে সিমুলেশনের মাধ্যমে দেখা সম্ভব হচ্ছে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের সুবৃহৎ পরিসরে এর ব্যবহার ব্যাপক। জটিল অপারেশন, কৃত্রিম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংযোজন, ডিএনএ পর্যালোচনা ইত্যাদিসহ নবীন শল্যচিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ ও রোগ নির্ণয়ে ব্যাপক হারে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যবহৃত হয়।

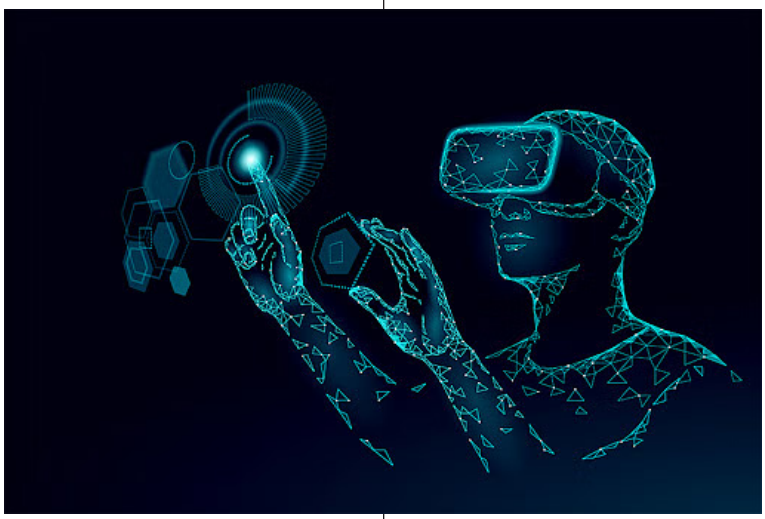

ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মাধ্যমে সত্যিকার যুদ্ধক্ষেত্রের আবহ তৈরি করে সৈনিকদের উন্নত ও নিখুঁত প্রশিক্ষণ প্রদান করা যায়। সত্যিকারের যুদ্ধকালীন বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে সৈনিকরা তাদের সঠিক করণীয় সম্পর্কে আগেই পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়ে থাকে।

যানবাহন চালানো ও প্রশিক্ষণে : ভার্চুয়াল রিয়েলিটির সবচেয়ে বাস্তবমুখী ব্যবহার হয়ে থাকে ফ্লাইট সিমুলেটরে, যেখানে বৈমানিকরা বাস্তবে আসল বিমান উড্ডয়নের আগেই বিমান পরিচালনার বাস্তব জগৎকে অনুধাবন করে থাকেন। এ ছাড়া মোটরগাড়ি, জাহাজ ইত্যাদি চালানোর প্রশিক্ষণে সংশ্লিষ্ট সিমুলেটর ও মডেলিং সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ-সংশ্লিষ্ট কৃত্রিম পরিবেশ তৈরি করে বাস্তবের মতো প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে।

নানা ধরনের বিনোদনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ ভার্চুয়াল রিয়েলিটির সঙ্গে সবচেয়ে বেশি পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। ত্রিমাত্রিক পদ্ধতিতে নির্মিত ভার্চুয়াল রিয়েলিটিনির্ভর কল্পকাহিনি, পৌরাণিক কাহিনি, কার্টুন, ঐতিহাসিক চলচ্চিত্র ইত্যাদি মানুষের কাছে জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। আধুনিক সময়ের প্রায় প্রতিটি চলচ্চিত্রে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির ব্যবহার দেখা যায়। ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যবহার করে নানা ধরনের কম্পিউটার গেম সবার কাছে জনপ্রিয়তা পেয়েছে। মিউজিয়াম বা ঐতিহাসিক যেসব জায়গায় ভ্রমণ করা সবার পক্ষে সম্ভব হয় না, ভার্চুয়াল রিয়েলিটি পদ্ধতি ব্যবহার করে সেসব জায়গায় ভ্রমণ করার অনুভূতি পাওয়া সম্ভব হয়।

এ ছাড়া প্রাত্যহিক জীবনে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির আরো অনেক প্রভাব রয়েছে। অদূর ভবিষ্যতেই আমরা মেটাভার্সের দুনিয়ায় প্রবেশ করতে যাচ্ছি, যেটা ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মাধ্যমে মানুষের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নকে আরো দ্রুত বিকশিত করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। আমরা এখন ভিআর প্রযুক্তি ব্যবহার করে ঘরে বসেও বন্ধুদের সঙ্গে বাইরে বসে আড্ডা দেওয়া, শপিং করা, খেলাধুলা করার অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি পেতে পারব।

পরিশেষে উল্লেখ্য, ভার্চুয়াল রিয়েলিটির অনেক বাস্তব ব্যবহার থাকার পরেও কম বয়সি বা শিশুদের বেলায় এর যথেচ্ছ ব্যবহার নিয়ে সতর্ক থাকার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, একজন প্রাপ্তবয়স্ক যেভাবে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির পরিবেশে প্রতিক্রিয়া করে, সে তুলনায় একজন কম বয়সির প্রতিক্রিয়া অনেক তীব্র এবং দীর্ঘস্থায়ী। শুধু তাই নয়, এর যথেচ্ছ ব্যবহার তাদের শিখন ক্ষমতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এ ছাড়া আমাদের দেশে ভিআরের মতো আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং উপযোগিতা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন যথ যথ মানবসম্পদ উন্নয়ন (শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ), সর্বস্তরে উচ্চ গতিসম্পন্ন ইন্টারনেট অবকাঠামো, উন্নতমানের ভিআর ডিভাইস আমদানি এবং সরকারি আইন নিয়ন্ত্রিত প্রয়োগবিধি। তবে আশার কথা, বর্তমান সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগ এবং বিকাশমান প্রযুক্তি অবকাঠামোর ক্রমোন্নতি ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মতো আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে বাংলাদেশকে সামনের দিকে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে নেবে।

এআইয়ের অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা যাবে! ৬ আগস্ট, ১৯৪৫। লোয়ার সারানাক লেক, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র। ছুটি কাটাতে নৌবিহারে এসেছেন আলবার্ট আইনস্টাইন। রেডিওতে বেজে ওঠা একটি খবর তার কানে এল। মুহূর্তে মনটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন আইনস্টাইন। খবরটা ছিল, জাপানের হিরোশিমায় পারমাণবিক বোমা ফেলেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

আইনস্টাইন চেয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্র যেন পারমাণবিক বোমা বানায়। কিন্তু কারো ওপর সেটা মারার দরকার নেই। কেবল নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই লক্ষ্য। কারণ হিটলারের জার্মানি এ বোমা বানাতে পারে। এজন্য তিনি তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টকে একটি চিঠিও লিখলেন। মূলত এ চিঠি যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক বোমা তৈরিতে অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। এর পরের ইতিহাস সবার জানা।

১৯৭০ সালে ১৯০টি দেশ পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি স্বাক্ষর করে। প্রতি পাঁচ বছর পরপর সেই আইন যথেষ্ট কিনা তা যাচাইও করা হয়। এসব কথা বলার কারণ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)। যাকে সোজা বাংলায় বলা যায় বুদ্ধিমান যন্ত্র। এই এআইকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তা নিয়ে এখন বিশ্বজুড়ে আলোচনা চলছে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ এআইয়ের ঝুঁকি ও সুবিধা নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক নির্দেশিকা প্রণয়নের জন্য কাজ করছে। সর্বশেষ ২১ মার্চ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে এআই-সম্পর্কিত প্রথম বৈশ্বিক প্রস্তাব পাস হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাবটি উত্থাপন করে। সহপ্রস্তাবক ছিল আরো ১২৩টি দেশ। ১৯৩টি দেশ এআই নিয়ে প্রস্তাবটির পক্ষে হ্যাঁ ভোট দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, প্রস্তাবটি এআইয়ের এগিয়ে যাওয়ার পথ তৈরি করবে। এখানে প্রতিটি দেশ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে ও ঝুঁকি মোকাবেলায় এক হয়ে কাজ করবে। প্রস্তাবটিকে এআই বিষয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ধারাবাহিক উদ্যোগের একটি বড় পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

এর আগে ২০২৩ সালের নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশ এআই নিয়ন্ত্রণে প্রথম আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষর করে। এআই আইন তৈরির বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রেও চেয়ে এগিয়ে রয়েছে ইউরোপ। ইউরোপীয় ইউনিয়নের আইনপ্রণেতারা এআই নিয়ন্ত্রণে একটি অস্থায়ী চুক্তি স্বাক্ষর করেন সম্প্রতি।

বাংলাদেশেও এআই নিয়ন্ত্রণের ঢেউ এসে লেগেছে। সম্প্রতি আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেন, এআই আইনের খসড়া তৈরি করা হবে। এআই যেভাবে পৃথিবী বদলে দিচ্ছে, সেটার ব্যাপারে একটি আইন সারা পৃথিবীতে চিন্তা করা হচ্ছে। বাংলাদেশেও একই রকম চিন্তা করছে। সেই চিন্তা থেকেই আইনের একটি মৌলিক কাঠামো নিয়ে আলোচনা চলছে

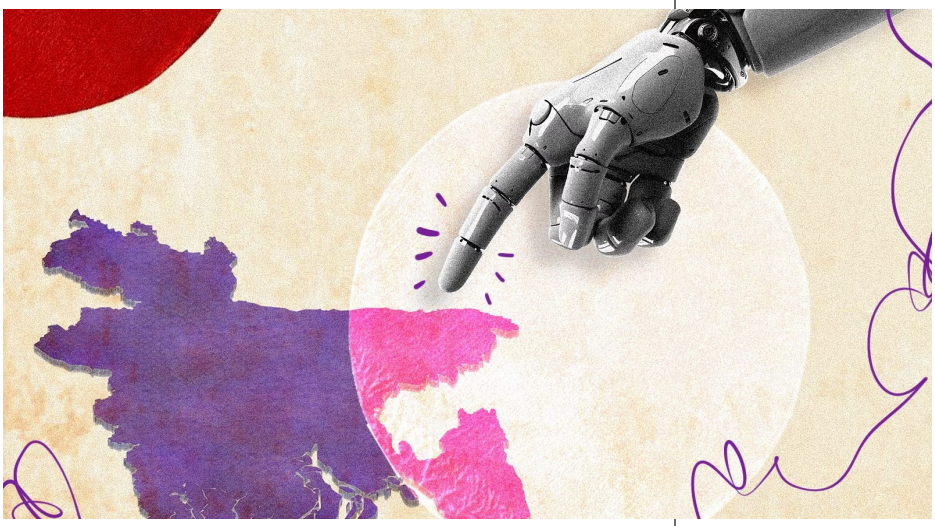

বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী। আমরাও অনুভব করি, এআইকে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে আমরা এআই নিয়ে আমাদের উদ্বেগ এবং প্রশ্নগুলো উত্থাপন করতে চাই।

আমরা এ কারণে উদ্বিগ্ন যে, পৃথিবীতে বহু রকমের মারণাস্ত্র রয়েছে। এসব অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের জন্য নানা দেশে নানা নামে আইনও রয়েছে। কিন্তু প্রতিদিন বহু মানুষ এসব অস্ত্রের আঘাতে মারা যাচ্ছে। শুধু আইন দিয়ে মারণাস্ত্রের ব্যবহার বন্ধ করা যায়নি। এ কারণে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, শুধু আইন দিয়ে কি এআইয়ের অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা যাবে?

কিছু কিছু অঞ্চলে আত্মরক্ষার্থে অস্ত্রের ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু আমরা প্রায়ই দেখি এসব অস্ত্রের কারণে বহু মানুষ অকালে প্রাণ হারাচ্ছে। বিশেষ করে পাশ্চাত্যের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অস্ত্র হামলাগুলো আমাদের হতবাক কওে দেয়। আত্মরক্ষার্থে অস্ত্রের ব্যবহারের অনুমতির সঙ্গে আরেকটি প্রশ্ন জড়িত। তা হচ্ছে, কোনো দেশ কি আত্মরক্ষার্থে অন্য দেশের ওপর হামলা চালাতে পারে? বিশেষ করে নতুন করে যুদ্ধ-সংঘাতে জড়িয়ে পড়া আজকের এ পৃথিবীতে প্রশ্নটি খুবই প্রাসঙ্গিক। কারণ একদিকে জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করে ইউক্রেনে আগ্রাসন চালাচ্ছে রাশিয়া। অন্যদিকে ইসরায়েল একই যুক্তিতে গাজায় আগ্রাসন চালাচ্ছে। আমরা জানি, পৃথিবীর বহু দেশের সরকার উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিরোধী মতকে দমন করছে।

এটা ঠিক, আরব বসন্ত সৃষ্টির পেছনে অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে সোশ্যাল মিডিয়া। কিন্তু সেই যুগ আর নেই। সোশ্যাল মিডিয়া তথা অনলাইন নিয়ন্ত্রণে উন্নত প্রযুক্তি ও আইন তৈরি হয়েছে। ফলে দেখা যাচ্ছে, প্রযুক্তির সুফল যতটা না পাচ্ছে জনগণ তথা সাধারণ মানুষ, তারচেয়ে বেশি পাচ্ছে সরকার তথা প্রভাবশালী গোষ্ঠী। এআই নিয়ন্ত্রণের জন্য যেসব যুক্তি রাষ্ট্রগুলো দেখাচ্ছে, এর মধ্যে একটি হচ্ছে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াসহ বিভিন্ন জালিয়াতি বা অন্যান্য ক্ষতির কারণ হতে পারে এআই। এর পেছনে সরকারগুলোর ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার চিন্তা থেকে থাকতে পারে।

এটা ঠিক, ১০ বছর পর পৃথিবী কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা আমরা হয় তো কল্পনাও করতে পারব না। এরই মধ্যে কিছু নমুনা প্রকাশ পাচ্ছে। শ্রমিক হিসেবে এআই নিয়ন্ত্রিত বট নিয়োগ দিয়েছে বহু কারাখানা। লন্ডন শহরের ডিজাইন মিউজিয়ামে ২০২১ সালের ১৮ মে থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত একটি পোর্ট্রেট প্রদর্শনী হয়েছিল। পোর্ট্রেটগুলো এঁকেছে আডিয়ান মেলার, যাকে বলা হয় পৃথিবীর প্রথম রোবট শিল্পী। হালের মডেল আইটানার কথা বলা যায়। গোলাপি চুল। টানা চোখ। চোখা নাক। পাতলা ঠোঁট। নজরকাড়া চেহারা। যাকে বলে আবেদনময়ী। ২৫ বছর বয়সী স্পেনের জনপ্রিয় মডেল। তবে আইটানা রক্ত-মাংসের মানুষ নয়। একজন এআই মডেল। ইনস্টাগ্রামে তার ফলোয়ার তিন লাখ ছাড়িয়েছে। প্রতি মাসে তার গড় আয় ১০ হাজার ডলারের ওপর। এখানেই শেষ নয়। সিনেমাকে বলা হয় সবচেয়ে ব্যয়বহুল শিল্পমাধ্যম। এআই এসে সেই ধারণাও পাল্টে দিচ্ছে। কোনো শুটিং সেট থাকবে না। প্রয়োজন পড়বে না বহু পারিশ্রমিক দাবি করা নায়ক বা নায়িকা। এমনকি লাগবে না কোনো ক্যামেরাও। সিনেমার ইতিহাসই পাল্টে দিতে যাচ্ছে এআই। ব্রিটিশ রাজপরিবারের একটি ছবি এরই মধ্যে এআইয়ের তৈরি বলে স্বীকার করেছেন সংশ্লিষ্টরা।

এক সাংবাদিক আইনমন্ত্রীকে প্রশ্ন করেছিলেন, এআই আইনের ফলে কী হবে? জবাবে আনিসুল হক বলেন, 'এ আইনের ফলে কী হবে, সেটি আমাদের কাছেও জিজ্ঞাস্য। তার কারণ হচ্ছে, আমরা কতটুকু নিয়ন্ত্রণ করব। কিন্তু এ বিষয়টুকু আমি বলতে পারি যে মানুষের অধিকার সংরক্ষণের জন্য এবং সর্বক্ষেত্রে সেটা সংরক্ষণের জন্য, মানুষের সুবিধার জন্য এআইকে যাতে ব্যবহার করা যায়, সেই চেষ্টাই করব।' আমরা আশা করব, আইনমন্ত্রী তার এ কথা রাখবেন।

হীরেন পণ্ডিত: প্রাবন্ধিক, কলামিস্ট ও রিসার্চ ফেলো
ফিডব্যাক: *hiren.bnnrc@gmail.com*
ছবি: ইন্টারনেট